# অন্নপূর্ণা

যুথিকা বড়ুয়া

পাখীর কলোরবে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল পামেলার। পূর্বদিগন্তের প্রান্তরে উষার প্রথম সূর্য্যের কোমল রক্তিমাভা জানালার পর্দা ভেদ করে আবিরের মতো লাল হয়ে গিয়েছে সারাঘর! ভোরের স্নিগ্ধ মৃদু শীতল বাতাস আমোদিত হয়ে আছে, রং-বেরংএর ফুলের সৌরভে। কি আনন্দময় হাস্যোৎজ্জ্বল সকাল। যেন সমস্ত মানুষকে অভিবাদন জানাচ্ছে আর অকুণ্ঠভাবে আহ্বান করছে, প্রকৃতির মন মাতানো বৈচিত্র্যময় রূপ আস্বাদন করার জন্য। চারিধারে হৃদয় আকুল করা কি মধুর আবেশ! ছুঁয়ে যায় মন-প্রাণ, সারাশরীর। ভরে ওঠে পরিতৃপ্তিতে।

চোখ মেলতেই প্রাকৃতিক রূপবৈচিত্র্যের সমাহার ও প্রাণবন্ত উচ্ছাসের টানে মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠল পামেলা। ঢং ঢং করে ঘড়ির ঘন্টায় জানিয়ে দেয়, সকাল ছ'টা বাজে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ পঞ্চমী। দেবী বোধনের দিন। আর তক্ষুণিই আড়মোড়া ভেঙ্গে পামেলা চাঙ্গা হয়ে উঠল। আজ সন্ধ্যায় বান্ধবী ঈশিতা, শম্পা, লাবণী ওরা সবাই বুড়ো শিবতলার পূজামন্ডবে আসবে, দেবীর বোধন দেখতে। ঈশিতার মামাতো ভাই নিখিলদাও আসবে। খুউবই মজার মানুষ সে! কথায় কথায় হাসায়। দারুণ মজা হবে!
ভাবতে ভাবতে কখন যে তন্ময় হয়ে ডুবে গিয়েছিল কাল্পনায়, খেয়ালই ছিলনা ওর। হঠাৎ টেলিফোনের ঝন্‌ঝন্ শব্দে চমকে ওঠে। অবিলম্বে রিসিভারটা দ্রুত তুলতে যেতেই পাশের ঘর থেকে ভেসে আসে ফিস্‌ফিস্ শব্দ। খক্‌টা লাগল পামেলার। আশ্চর্য্য, এই সাত-সকালেই এতো জরুরী তলব মায়ের! ফোনটা এলো কোত্থেকে! আর করলো ইবা কে!
নিঃশব্দে রিসিভারটা তুলে আড়ি পেতে শুনলো পামেলা। আর শোনামাত্রই বুকটা ওর কেঁপে উঠল। থেমে গেল ওর প্রাণবন্ত উচ্ছাস। আনন্দময় উচ্ছলতা। বিষন্নতায় ছেয়ে গেল মন। কে এই ভদ্রলোক? সে কার মুখ দেখতে চায়না? কে তার সর্বণাশ করেছে? কে সে? আর মায়ের সঙ্গেই বা তার কি সম্পর্ক?
দৌড়ে আসে পামেলা। ওর চোখেমুখে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা! কিছু বলার ব্যকুলতায় ঠোঁটদু'টো কাঁপছে। ইতিপূর্বে হঠাৎ ওকে দেখে থতমত খেয়ে গেল রমলা। লাইনটা তক্ষুণি কেটে দিলো। একটা ঢোক গিলে ফ্যাস্‌ফ্যাস্ শব্দে বলল, -'কিরে, উঠে এলি! কতবার বলেছি, রাতে শোবার আগে ফোনটা অফ্ করে রাখিস! ঘুমটা ভেঙ্গে গেল তো!' এমন স্বাভাবিক গলায় বলল, যেন কিছুই ঘটেনি!

পামেলা নিরুত্তর। জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মুখে কিছু না বললেও অজানা বিভীষিকায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল। কিন্তু অজ্ঞাত অপরিচিত লোকের সাথে মায়ের কথোপকথনের বিষয়-বস্তুটি অবগতর জন্যই ওযে উৎসুক্য হয়ে আছে, তা বোধগম্য হতেই ওকে উপেক্ষা করে রমলা বলল,-'ওমা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি! গিয়ে শুয়ে পড়, যা! গড়িয়ে নে আর কিছুক্ষণ!'
বলে এক মুহূর্ত্যও আর দাঁড়ালো না। শাড়ির আঁচলে মুখ গুঁজে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পামেলা নাছোড়বান্দা! মায়ের পিছে পিছে চলে আসে ঠাকুরঘরে। চমকে উঠল রমলা। পড়ে যায় বিপাকে। এখন কি জবাব দেবে সে! মুখ খুললেও বিপদ, না খুললেও বিপদ! উভয় সংকট! বিড়বিড় করে বলল,-'হে করুণাময়ী, দুর্গতিনাশিনী, এ আমায় কোন্ পরীক্ষায় ফেললে মা, মাগো! আমায় শক্তি দাও মা!'

বলে ধপাস করে বসে পড়ল সোফায়। পাথরের মতো নিস্তেজ নিথর হয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চকিতে তন্ময় হয়ে ডুবে গেল কল্পনায়। জলছবির মতো ধীরে ধীরে মনঃশ্চক্ষে ভেসে উঠতে লাগল, ঘোর আমাবশ্যার সেই গভীর নিশুতিরাত। প্রলয়ঙ্করী বেগে ভয়াবহ তুফানি পবন। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিদ্যুতের বাঁকা ঝিলিক! গুড়ুম গুড়ুম মেঘের গর্জন! মরা কাঁন্নার মতো একটানা বাতাসের গোঙ্গানী। রাজ্যের ধূলোবালি উড়িয়ে, গাছের ডালপালা ভেঙ্গে মুছড়ে ছুটে চলে দিগ্বিদিকে। তন্মধ্যেই শুরু হয়, মুসলধারে বৃষ্টি। যেন আকাশটাই ভেঙ্গে পড়বে! যেদিন প্রসবকালীন জটিলতার প্রচন্ড যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সদ্য নবজাত শিশুকন্যার জন্মলগ্নে চিরবিদায় নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে নীরবে চলে গেল পামেলার গর্ভধারিনী মা, সাবিত্রী! যেকথা আজও ওর অজানা! কিন্তু সেদিন কি ভেবেছিল কেউ, যন্ত্রদানব এতো অসময়েই সাবিত্রীর জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেবে! ও' চির নিদ্রায় শায়ীত হবে! কি হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্য! একদিকে যমে মানুষে টানাটানি! অন্যদিকে সদ্য ভূমিষ্ঠ নবজাত শিশু কন্যার একটানা বিরক্তিকর কাঁন্না!

একেই বলে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিণতি! নির্মম পরিহাস। যেন হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় চোখের নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল, যোশ্বেরের সুখী সংসার ও আনন্দোৎচ্ছল জীবন নদীর প্রবাহ। তার সংসার নামক তড়ীখানা ডুবে গেল মাঝ দরিয়ায়। যেদিন নিয়তির নিমর্মতায় জীবনের সবচে' আনন্দঘন মুহূর্তে প্রিয়তমা পত্নী বিয়োগের শোকে, দুঃখে বিহ্বলে মুহ্যমান যোগেশ্বর উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। বিরহ-কাতরতায় তাকে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে ছিল। জীবনকে অর্থহীণ এবং নির্মোহ করে তুলেছিল। তারুণ্যকে জলাঞ্জলী দিয়ে বেছে নিয়েছিল, নির্বাসিত জীবন। কোনো স্পৃহাই তার ছিলনা! যেদিন মানসিক শূন্যতাবোধে মনোবল, বেঁচে থাকার ইচ্ছা, জীবনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন-আশা-ভালোবাসা বিরহের আগুনে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল।

যোগেশ্বরের ধারণা এবং দৃঢ় বিশ্বাস, সন্তানই বয়ে এনেছিল, তার সংসারের অমঙ্গল বার্তা। জীবনে একমাত্র সর্বনাশের  কারণ। ধ্বংসের মূল। অলক্ষনী, সর্বনাশিনী!
সর্বোপরি অসহিষ্ণুতার কারণে ক্ষোভে দুঃখে বেদনায় যে অনাগত ভবিষ্যৎবাণী প্রিয়তমা স্ত্রী সাবিত্রীর জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উচ্চারিত হয়েছিল, যোগেশ্বর তা দৃঢ়ভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখে, তার মনের মণিকোটায়! যা আজও একান্তে নির্জনে নিরবিচ্ছিন্ন একাকী সন্ধ্যায় বারবার আঘাত করে, পীড়ি দেয় তার মুমূর্ষ্য হৃদয়কে। পারেনি, তা হৃদয় থেকে অপসারিত করতে! পারেনি, স্ত্রী হারানোর শোক, দুঃখ-বেদনা সব ভুলে পামেলার মুখদর্শণ করতে। আর করেনি বলেই নিজ সন্তানকে পিতৃস্নেহ-আদর-ভালোবাসার দৃঢ় বন্ধনে আজও বাঁধতে পারেনি। পারেনি, হৃদয়কে স্পর্শ করার মতো সন্তানের কোনো অবয়বই তার স্মৃতির গ্রন্থিতে ধরে রাখতে। আর তাই নির্দয় নিষ্ঠুরের মতো সংস্কারপ্রবণ যোগেশ্বর তার নবজাত শিশুকন্যাকে পিতার স্নেহস্পর্শ থেকে আজও পৃথক করে রাখে। যার ভরণ পোষণের সার্বিক দায়-দায়িত্বের ভার রমলা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার ছত্রছায়ায় আলগে রেখে আজ এতকাল যাবৎ মাতৃত্বের শূন্য হৃদয়াঙ্গিনা ভরে রাখে, আদরনীয়া কন্যা পামেলার আহাল্লাদে, আবদারে, হাসি-কলোতানের মধুর গুঞ্জরণে!

শ্বশুড়কূলের অগাধ সম্পত্তি রমলার। অথচ ভোগ করার মতো তিনকূলে কেউ নেই। বংশে বাতি দেবারও কেউ নেই! স্বামীর মৃত্যুকালে স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি সবই উইল করে দিয়ে যায় রমলার নামে। ওর অবর্তমানে পামেলা। যার লালন-পালনে মুছে ফেলেছিল, বন্ধা নারীর কলঙ্ক। পূরণ করেছিল, মা হওয়ার সাধ! যার রক্ষণাবেক্ষণে জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়ে রমলা ভুলে গিয়েছিল, স্বামী হারানোর শোক, দুঃখ, বেদনা! ভুলে গিয়েছিল, অকাল বৈধব্যের অন্তর্নিহিত কঠিন যন্ত্রণা। গর্ভে ধারণ না করলেও, সন্তান ও মায়ের (নাড়ীর) চিরন্তন একাত্ম বন্ধন না থাকলেও, স্নেহ-মমতা ও হৃদয় নিঃসৃত ভালোবাসায় অচীরেই

দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়, এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধন! আত্মার সম্পর্ক। আজ ও' কেমন করে বলবে, যোগেশ্বরই ওর জন্মদাতা পিতা, আজও জীবিত!
বস্তুত একথা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য, যে রমলা ওর গর্ভধারিনী মা নয়। যে কথা যোশ্বেরের শপথ বাক্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আজ এতগুলো বছর বুকের ভিতর পাথর চাপা দিয়ে চন্দ্র, সূর্য্যের মতো এত বড় একটা সত্য ঘটনাকে গোপন করে রেখেছিল। ঠিক এই ভয়ই করেছিল রমলা, সত্য কখনো চাপা থাকেনা। উদ্ঘাটন একদিন হবেই!
কিন্তু পামেলাকে কি জবাব দেবে সে! এখন ও' আর ছোট নেই! ভালো-মন্দ বোঝার যথেষ্ট ক্ষমতা হয়েছে ওর। বয়সের তুলনায় তর তর করে ষোড়শীতেই পূর্ণযুবতী হয়ে উঠেছে। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক, সেটা যাবে কোথায়! বাপের মতোই একরোখা। বিরল সেন্টিমেন্টাল। অনমনীয় তার জেদ। সহসা ছাড়বার পাত্রী নয়। পিছুই ছাড়েনা মায়ের! ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলে আসে পিছে পিছে। কিন্তু ওর মৌনতা, বিমূঢ়তা এবং বিষন্ন চোখের চাহনি লক্ষ্য করে মুখ লুকাবার চেষ্টা করে রমলা। এক্ষুণিই বিস্ফোরণ যে একটা ঘটবে, তা টের পেয়ে কম্পিত হতে লাগল বুক। অশ্রুকণায় চোখদু'টো ছল্ছল্ করে উঠল। পারল না অশ্রু সংবরণ করতে, পামেলার নজর এড়িয়ে যেতে। আঁচলে চোখ মুছতেই মায়ের সন্নিকটে দ্রুত এগিয়ে আসে পামেলা। উত্তেজিত হয়ে বলল, -'মা, তুমি কাঁদছো? কিন্তু কেন? ভদ্রলোকটি কে? কি চায় সে? তিনি কার সম্বন্ধে কথা বলছিলেন?'

শূন্য দৃষ্টি মেলে পাথরের মতো শক্ত হয়ে থাকে রমলা। মুখে ভাষা নেই। নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। এতক্ষণ যা কিছু ওর কল্পনায় বিচরণ করছিল, এখন তা প্রতিবিম্বের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। ভিতরে ভিতরে একটা আশঙ্কায় ওকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে লাগল। জীবনের শেষ সম্বলটুকুও হারাতে হয় যদি! যদি কখনো আর 'মা' বলে না ডাকে! রমলা বাঁচবে কাকে নিয়ে!
ইতিপূর্বে পামেলার কম্পিত কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে। -'বলো মা বলো, চুপ করে থেকো না! বলো ঐ ভদ্রলোকটি কে? সে কেন তোমায় বিব্রোত করছিলেন? কি জানতে চায় সে?'

বিনয়ী চোখে তাকায় রমলা। ওর ঠোঁট কাঁপে! ধুক্ধুক্ করে বুক কাঁপে! বিন্দু বিন্দু শিশির কণার মতো টপটপ্ করে ঝড়তে লাগল, দু'চোখের প্রপাতরাশি। কিন্তু ও' কেমন করে বলবে, ক্ষণপূর্বে যে ব্যক্তির কণ্ঠস্বর টেলিফোনে ভেসে এসেছিল, সে আর অন্য কেউ নয়, ওরই জন্মদাতা পিতা যোগেশ্বর! একই শহরে বসবাসরত, সুস্থ্য, শক্ত-সামর্থ এবং জীবিত! যার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই পামেলার।

ইতিপূর্বে টেলিফোনের রিংটা হঠাৎ ঝন্ঝন্ শব্দে বেজে উঠতেই কেঁপে উঠল দুজনে। দ্রুত রিসিভারটা তুলে পামেলা বলল, -'হ্যালো!'
ভেসে এলো সেই কণ্ঠস্বর।-'হ্যাঁ রে, রমা, লাইনটা কেটে গেল কেন হঠাৎ! ভালো আছিস তো তোরা? কি রে, কথা বলছিস না কেন? চটে গিয়েছিস খুব, তাই না! কি করবো বল, কিছুতেই যে ভুলতে পাচ্ছিনা!'
তৎক্ষণাৎ এপাশ থেকে পামেলা বলল, -'আপনি কে বলছেন?'
-'সে কিরে, আমায় চিনতে পাললি নে, আমি যোগেশ্বর!'
শুনে থ্ হয়ে যায় পামেলা। নিঃশ্চুপ হয়ে থাকে। মনে মনে বলল, যোগেশ্বর, এ আবার কে! এ নাম আগে তো কখনো শুনিনি! চোখেও তো দ্যাখেনি কোনদিন! অথচ কথাবার্তায় খুউবই ঘনিষ্ঠ মনে হচ্ছে মায়ের! কে লোকটা!'
কিন্তু রমলা ঠিকই অনুমান করেছিল। শোনার জন্য এতক্ষণ উৎসুক্য হয়েছিল। কিন্তু পামেলার চোখেমুখের ভাব-ভঙ্গি দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। ভাবল, ফোনটা ওরই কোনো বান্ধবী হবে হয়তো! এই ভেবে

নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পামেলা টের পেলো না! তন্ময় হয়ে কল্পনায় ডুবে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ থেমে বলল, -'আমি রমা নই, পলি! আপনি কোথা থেকে বলছেন?'

যোগেশ্বর নিরুত্তর। জীবনে আজ প্রথম আপন সন্তানের স্নেহস্পর্শী শ্রুতিমধুর কোমল কণ্ঠস্বরে বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। বিদ্যুতের শখের মতো সারাশরীরেও যেন একটা ঝটকা লাগল! রিসিভারটা তক্ষুণি হাত থেকে পড়ে গেল মাটিতে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। কি অদ্ভুদ একটা শিহরণ, কি নিদারুণ একটা কোমল অনুভূতি! যা পূর্বে কখনো এমন অনুভব করেনি! যা ব্যাখ্যারও অতীত। ভাষায় ব্যক্ত করা যায়না। অথচ কিছুক্ষণ আগেও মন-মেজাজ ক্ষিপ্ত হয়েছিল যোগেশ্বরের। কত অকথা-কুকথা মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল।
কিন্তু এ আর নতুন কি! প্রতিবছর শারদীয় উৎসবে দেবী দূর্গার আগমনের প্রারম্ভকালে মাথাটা কেমন বিগড়ে যায় যোগেশ্বরের। হোঁশ-জ্ঞানই থাকেনা। একাকী নিঃসঙ্গতায় দিশা হারিয়ে পাগলের মতো কল্পনায় খুঁজে বেড়ায়, তার মৃতা স্ত্রী সাবিত্রীকে। সেই কখন চা-জল খাবার নিয়ে বসেছিল। অথচ খাওয়ার রুচী নেই। খাবারের প্রতি ভক্তি নেই। কোনো উৎসাহ নেই। মুখেই ঢুকছিল না। কিন্তু যাদু-মন্ত্রের মতো হঠাৎ মানসিক পরিবর্তনে অপ্রস্তুত যোগেশ্বর মুহূর্ত্যের জন্য বাক্যহীন হয়ে পড়ে। আওয়াজই বের হয়না গলা দিয়ে। সময় বয়ে যায় নীরবে। হঠাৎ আপন মনে বিড়বিড় করে ওঠে, -'পলি, আমার সে-ই ছোট্ট শিশুকন্যা!'

নামটা উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই সব এলোমেলো হয়ে গেল স্মৃতিকাতর যোগেশ্বরের। চকিতে হারিয়ে গেল, সেদিনের সেই মুহূর্তে, যেদিন প্রিয়তমা স্ত্রী সাবিত্রীর মহাপ্রয়াণে দ্বিগ্বিদিক শূন্য হয়ে ভুলে গিয়েছিল, তার নৈতিকতা, মানবিকতা ও জীবনের মূল্যবোধ! যার অভাবে পিতৃস্নেহ থেকে যাকে এতকাল ড়াঞ্চিত করে রেখেছিল, আজ ক্ষণপূর্বে তারই সুকোমল কণ্ঠস্বরে ছুঁয়ে গেল পিতৃত্বের শূন্য হৃদয়। কানায় কানায় ভরে গেল, আদর-স্নেহ-ভালোবাসা। এ যেন এক বর্ণনাতীত অভিনব অনুভূতি!
হঠাৎ প্রগাঢ় আবেগে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল যোগেশ্বর। ইচ্ছে হচ্ছিল, অপরাধ স্বীকার করে নিজেকে ধরা দিতে। পিতৃত্বের আর অভিভাবকের দাবি নিয়ে পিতার পরিচয় দিতে। যে মিথ্যে সংস্কারের দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে সন্তানের কলঙ্ক রচনা করেছিল, আজ তারই সুমিষ্টি কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হোক, পিতা শব্দের চিরন্তন সত্য ও পবিত্র ধ্বনী। ঘুঁচে যাক, যোগেম্বরের কু-সংস্কার! মুছে যাক অন্তরের সকল গ্লানি।
অনুভব করে, পিতৃস্নেহ-মমতা-ভালোবাসার শিথিল বাঁধন কে যেন সজোরে টেনে ধরলো। ভিতরে ভিতরে টের পায়, এক ধরণের বেদনানুভূতির তীব্র দংশণ। যা নদীর ঢেউএর মতো বারবার ফিরে এসে মস্তিস্কের স্নায়ূকোষে আঘাত করতে লাগল। কি কঠিন, অসহনীয় এ মুহূর্ত, অথচ এমন গহীন অনুভূতি দিয়ে কখনোই অনুভব করেনি! মন-প্রাণ, সমস্ত শরীর যেন ক্রমশ সম্পৃক্ত হতে থাকে, এক অদৃশ্য স্নেহ-ভালোবাসার গভীর বন্ধনে! আর তাই ক্ষণপূর্বের কিশোরী কন্যা পামেলার মায়াজড়িত শ্রুতিমধুর কোমল কণ্ঠস্বর প্রতিঃধ্বনীত হয়ে আজ বারবার কানে বাজতে লাগল যোগেশ্বরের।

এ কেমন বিধাতার লীলাখেলা! ভাগ্যের পরিক্রমায় বাস্তব সত্যতার সংঘাতে যোগেশ্বর আজ নিজেই নিজের কাছে পরাস্ত, অপদস্থ, অনুতপ্ত ও মর্মাহত! ক্ষণিকের মৌনতায় এবং বিমূঢ়তায় আজ অপরাধী, দোষী মনে হয় নিজেকে!
একেই বলে রক্তের টান! শরীরের অংশ।আত্মার সম্পর্ক। যাকে কখনো অস্বীকার করা যায়না। আর যায় না বলেই যোশ্বেরের মতো একজন দুর্ভাগ্য পিতার আদর-স্নেহ-ভালোবাসার কোমল অনুভূতির তীব্র জাগরণে হঠাৎ মহাপ্রলয় ঘটে গেল তার অন্তরের অন্তরস্থলে। আর তৎক্ষণাৎ স্বগতোক্তি করে উঠল,-'পলি, তার সেই পরিতক্তা শিশুকন্যা! জন্মাবধি আদৌ যার মুখদর্শণ করেনি, চোখে দ্যাখেনি!

শাস্ত্রে আছে, 'পিতা পরমেশ্বর! পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম!' হে ভগবান, এ কি করলো সে! কেন এমন হলো! সন্তানের পিতা আমি, এ যে বড়ই অর্ধম, মারত্মক অপরাধ! আমায় ক্ষমা করো প্রভু, আমায় ক্ষমা করো!'

বিবেকের তীব্র দংশণে যোগেশ্বর আজ মুর্ছাণ্বিত, বাক্যাহত। অনুশোচনার আগুনে তার পাষাণহৃদয় বিগলিত হয়ে স্নেহাস্পদে সঞ্চালিত হতে লাগল সারাশরীর এবং মন! অনুভব করে, হৃদয় স্পর্শ করা এক অভিনব স্নেহানুভূতি! আর তা মরমে মরমে উপলব্ধি করেই হঠাৎ তার মন উদাস করা নির্জনতায় দাঁড়িয়ে অভাবনীয় ভাবনার উৎপত্তি হয় মস্তিস্কের মধ্যে। সে প্রশ্ন করে নিজেকে, স্ত্রী হারানোর শোকে বিহ্বলে একটি প্রস্ফূটিত ফুলের মতো সদ্য নবজাত শিশুকে পিতার স্নেহ-ভালোবাসা থেকে প্রবঞ্চিত করে, বিচ্ছিন্ন করে তার নিঃসঙ্গ জীবনে কি পেয়েছে সে? কখনো কি একদন্ড শান্তি পেয়েছিল কোনদিন? কখনো কি সুখনিদ্রায় জীবনযাপন করতে পেরেছিল কোনদিন?
অথচ সংস্কারের প্রবণতায় ও ক্রোধের বশে দীর্ঘদিন যাবৎ অহেতুক অন্তর্কলহে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে শরীর। বয়সের তুলনায় চিন্তাশক্তি ও প্রাণশক্তি অনেক কমে গিয়েছে যোগেশ্বরের। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে নিস্তেজ হয়ে বাড়ি ফিরে এসে ক্ষিদে-তৃষ্ণাও মালুম হয়না। পা টান টান করে শুয়ে পড়ে বিছানায়! প্রায়শই উপবাসে রাত কাটায়। আর সারারাত ঘুমের ঘোরে আবোল-তাবোল বকতে বকতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। ধড়ফড় করে ওঠে। কখনো জন শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে ওঠে বুক।
মনে মনে প্রচন্ড কষ্ট পায় যোগেশ্বর! আর বুকের কষ্ট-বেদনাগুলি তরল হয়ে ঝরঝর করে বেরিয়ে আসে চোখের কোণায়! কিন্তু আজ এর কি কৈফেয়ৎ দেবে সে!
ভাবতে ভাবতে ক্ষণপূর্বের সেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অসহ্য বেদনানূভূতির তীব্র দংর্শণে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠে যোগেশ্বর। মনঃস্তাপে হঠাৎ পূঞ্জীভূত দ্বিধা আর দ্বন্ধের কালো ছায়া সড়ে গিয়ে তার হৃদয়গহ্বরে জাগ্রত হয়, পিতৃত্বের তীব্র অনুভূতি! রক্তের স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ে শরীরের প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্রে। এক মুহূর্ত্যও স্তস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারেনা! কক্ষ্যচ্যুত উল্কার মতো তক্ষুণি উর্দ্ধঃশ্বাসে মরিয়া হয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

রিসিভারটা তখনও পামেলার হাতে। গলা ফাটিয়ে বার ক'য়েক হ্যালো বলল। কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে ধপ্ করে রেখে দিলো রিসিভারটা! বিরক্তি জড়িত কণ্ঠে বলল,-'রাবিশ, ননসেন্স! সক্কাল বেলায় দিলো  মুডটা অফ্ করে, ষ্টুপিড!'
শুনতে পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয় রমলা। রান্নাঘর থেকে হাক ডাক দিয়ে বলল,-'কি রে পলি, কাকে বলছিস তুই এসব কথা?'
গলার স্বর বিকৃতি করে পামেলা বলল,-'কে আবার, তোমার ঐ যোগেশ্বর না ঈশ্বর নামধারী লোকটা! কথাবাত্রা শুনে তো মনে হলো, তোমার বাল্যবন্ধু! অথচ আমার নাম বলতেই ব্যস, লেগে গেল মুখে তালা!' অট্টহাস্যে ব্যঙ্গ করে বলল, -'হেঃ, গাঁজা ফাজা খেয়েছে বোধহয়!'
চোখ রাঙিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে রমলা। চটে গিয়ে বলল, -'ছিঃ পলি, উনি বয়োঃজ্যেষ্ঠ মানুষ! তোমার পিতৃসমতূল্য, গুরুজন! অমন অকথ্য ভাষায় মন্তব্য করে তাক অসম্মান করতে নেই, পাপ হয়! তা কথা হয়েছে তোমার ওঁর সঙ্গে?'
লম্বা একটা হাই তুলে পামেলা বলল,-'তা'হলে আর বলছি কেন! কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা এখনো তো তুমি দিলে না মা!'
গম্ভীর হয়ে রমলা বলল,-'এতো ভাবনার কি আছে পলি, একদিন তুমি নিজেই সব জানতে পারবে! এ নিয়ে অযথা আমায় আর বিব্রোত করোনা! কি পাপ যে করেছিলাম, কপালে আরো কত কি লেখা আছে, ভগবান জানে!'

ইতিপূর্বে মুখ ভার করে ঘরে ঢুকে পড়ল পামেলা। পা টান টান করে আবার শুয়ে পড়লো গিয়ে বিছানায়। বিড়বিড় করে বকতে বকতে রমলা চলে গেল রান্নাঘরে।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে, পড়ন্ত বিকেলের ক্লান্ত সূর্য্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। চারিদিকে পূজো পূজো রব। মন্ডবে মন্ডবে ঢাক বাজজে, চন্ডীপাঠ হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। খুশীর পাল তুলে পাড়ার শিশু-কিশোর-কিশোরী, নবিন-প্রবীন সকলেই মেতে উঠেছে শারোদৎসবের আনন্দ মেলায়। পামেলা তখনও সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনের পরিচর্যা নিয়ে ব্যস্ত! হঠাৎ গাড়ির শব্দে চমকে ওঠে। জানালায় উঁকি দিয়ে দ্যাখে, ধূতি-পাঞ্জাবী পরিহিত এক অচেনা অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক উদ্ভ্রান্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমেই ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। পামেলা দৌড়ে মাকে গিয়ে বলল, -'দ্যাখা তো মা, কে যেন আসছে আমাদের বাড়িতে!'

বুঝতে দেরী হলো না রমলার! কে আর আসবে! আসার মতো ওর আর আছেইবা কে সংসারে! কিন্তু শুনেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর মুখখানা। আজ এতকাল পর যোগেশ্বর আসছে কিসের জন্য? কি চায় সে? বুকের জ্বালা এখনো কি ওর মেটেনি? সে কেমন মানুষ, নিজের সন্তানের প্রতি এতটুকু দয়া-মায়াও নেই অন্তরে! মেয়েটাকেও কি একটু শান্তিতে থাকতে দেবেনা কোনদিন? আজ কিছুই তো আর গোপন থাকবে না! নির্ঘাৎ চিৎকার চেঁচামিচি করে তুলকালামকান্ড একটা বাধিয়ে বসবে। আশেপাশের লোকজন জড়ো করবে! তামাশা দেখবে। কিন্তু পামেলা, আজ ওকে সামালাবে কে!

ইতিপূর্বে কলিং-বেলের রিং-টা ঝিন্‌ঝিন্ করে বেজে উঠতেই বুকটা কেঁপে করে উঠল রমলার! আসন্ন বিরূপ পরিস্থিতির অনুমানিক চিত্র কল্পনা করেই বিষাদে ছেয়ে গেল ওর মন-মানসিকতা!
অগত্যা শিথিল ভঙ্গিতে দরজাটা খুলে দিতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল যোগেশ্বর। বড়বড় চোখ মেলে অবাক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে পামেলার মুখের দিকে! -এ কি, এ যে অবিকল সাবিত্রী! যেন ওই পূণর্জনম নিয়েছে! সেই নাক, সেই চোখ, সেই জোড়া ভ্রু। মায়ের মতো সেই মায়াবী চোখের চাহনি। পিষ্ঠদেশ জুড়ে সেই ঘন কালো কোঁকড়ানো লম্বা কেশ! এ-ই আমার সেই কন্যা! আমারই সন্তান!
আর ভাবতে পারছে না যোগেশ্বর। সারা দূপুর ভবঘুরের মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে সময় অতিবাহিত করেছে। দ্বিধা আর আশংকা নিয়ে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে! এখন সে বড়ই ক্লান্ত! একটু শান্তি পেতে চায়। অথচ এই মুহূর্তে ক্লান্তি আর অবসন্নতার এতটুকু রেশ কোথাও নেই তার শরীরে। খুঁজে পায় প্রবল প্রাণশক্তি, ইচ্ছাশক্তি। জাগ্রত হয়, বেঁচে থাকার সাধ। যেন মরুভূমির মতো বিশুস্ক বুকখানা তার আনন্দাশ্রুর প্লাবনে প্লাবিত হয়ে ভরে গেল নিমেষে।
অব্যক্ত আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রণে অশ্রুসজলে চোখদু'টো লাল হয়ে উঠল যোগেশ্বরের। থর্‌থর্ করে হাত কাঁপে। ঠোঁট কাঁপে। অসহায় তার চাহনি। ভারি হয়ে আসে গলার স্বর। অবলীলায় দু'হাত প্রসারিত করে দিয়ে বলল,-'আয় মা আয়! আমার বুকে আয়! তোকে আজ দুচোখ ভরে দেখি! কতকাল দেখিনি! আ-হা, বুকটা আমার জুড়ে গেল! একেই বলে সংযোগ, সেই চওড়া লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরিহিতা, এলোকেশী, ঠিক এই বেশেই পঞ্চমী তিথীতে প্রথম দেখেছিলাম আমার সাবিত্রীকে! তুই তো আমার **অন্নপূর্ণা মা**! আমায় চিনতে পেরেছিস মা!'
ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল,-'ওরে, ওরে আমিই তোর হতভাগ্য জন্মদাতা পিতা, যোগেশ্বর! হ্যাঁ, আমিই তোর পিতা! আজ আমি বড় একা, নিঃসঙ্গ! বুকটা আমার কতকাল যাবৎ শূন্য হয়ে আছে! বাবা বলে একবার আমায় ডাক মা! মন যে আমার বড্ড উতলা হয়ে আছে! বড় আশা নিয়ে এসেছি, এই বুড়ো

ছেলেটাকে শূন্যহাতে ফিরিয়ে দিসনে মা! আয় মা আয়, আমার বুকে আয়!' বলতে বলতে দেওয়ালে মাথা ঠুকে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে যোগেশ্বর।

মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল পামেলা। যেন আকাশ থেকে পড়লো। আজ হঠাৎ এ কি শুনলো ও'! কখনো স্বপ্নেও তো কল্পনা করেনি কোনদিন! জেগে জেগে স্বপ্ন দেখল নাকি এতক্ষণ! প্রচন্ড আলোড়ণ সৃষ্টি করল ওর মধ্যে। ক্ষণিকের নীরবতায় হাজার প্রশ্নের ভীড়ে ওকে বিচলিত করে তুলল। একরাশ অভিমান, ক্ষোভ আর বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে মায়ের মুখপানে চেয়ে থাকে। কিন্তু কি বলবে রমলা! অপ্রত্যাশিত যোগেম্বরের আগমন ও তার অভাবনীয় ভাবমূর্তি লক্ষ্য করে বিস্ময়ে থ্ হয়ে গিয়েছিল। কখনো যা কল্পনাই করেনি! চোখেমুখেও নালিশ কিংবা অভিমানের ছাপ বিন্দুমাত্র কোথাও নেই যোগেশ্বরের!
অথচ একটা শব্দও আর উচ্চারিত হয়না রমলার। ভিতরে ভিতরে খুশীর প্লাবনে প্লাবিত করে হৃদয়ের দুকূল ওর ছেয়ে গেলেও অভিমান আর অব্যক্ত খুশীর সংমিশ্রণে চোখদু'টো ছল্‌ছল্ করে উঠল! কিন্তু ওর ঐ নীরব নির্বিকার আচরণে সত্য প্রমাণিত হতেই মনকে প্রচন্ড আন্দোলিত ও উদ্বেলিত করলো পামেলার! রাশি রাশি মনবেদনা, অভিমান আর নালিশ নিয়ে চোখমুখের বিচিত্র ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে কিসব বলতে লাগল! হঠাৎ কাঁন্নাজড়িত কণ্ঠে মায়ের হাতদুটো সজোরে চেপে ধরে বলল,-'তবে কেন তোমার এই বেশ? কেন বৈধব্যের সার্বিক রীতি-নীতিগুলি যথাযথ পালন করো? একাদশী করো, নিরামিশ আহার ভোজন করো, কেন, কেন করো এসব? কেন একথা এতদিন আমায় বলোনি? বলো মা বলো, কেন বলোনি? তোমাকে আজ বলতেই হবে, বলো কেন তোমার এই বেশ?'

পামেলার সন্নিকটে এগিয়ে আসে যোগেশ্বর। মৃদুস্পর্শে ওর মাথায় হাতটা বুলিয়ে বলল, -'ওকথা বলে ওকে কষ্ট দিসনে মা! ওতো আমার ছোটবোন রমা, তোর পিসি। কপাল দোষে অকাল বৈধব্যেই জীবনের সব রং মুছে গিয়েছে! তোর মা তো বহুদিন আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে! কোলে পিঠে করে তোকে রমাই লালন-পালন করেছে, বড় করেছে! তুই ছাড়া আমাদের আর কে আছে বল!'
ক্রোধে ফেটে পড়ে পমেলা। চোখমুখ লাল করে বলে,-'তবে কেন এতদিন আমায় দেখতে আসোনি? আমি কি অপরাধ করেছিলাম? আমায় কেন এতবড় শাস্তি দিয়েছ? কিসের জন্য? কেন এতদিন তোমরা আমায় জানাও নি?'
বলতে বলতে বাবার মুখপানে চোখ তুলে একপলক চেয়েই দৌড়ে ঘরে ঢুকে দরজাটা বিকট শব্দে বন্ধ করে দিলো।
রমলা বলল,-'দিলে তো মেয়েটার আনন্দ মাটি করে! যাও দাদা, এবার সামলাও তোমার মেয়েকে!

সমাপ্ত

৩রা অক্টোবর, ২০০৮
যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com